পাকিস্তান পর্ব (১৯৪৭-১৯৭১)

ইউনিট ২

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের দাবীর ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তবে শাসন, শোষণ, বঞ্চনা আর স্বৈরাচারের ফলে পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কখনো রাখঢাক বাদ দিয়ে, কখনো সুকৌশলে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য অব্যাহত রাখে। ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়নে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পথ ধরে ১৯৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-১: পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ	পাঠ-৯: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
পাঠ-২: ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-১৯৫২	পাঠ-১০: ১৯৭০ সালের নির্বাচন
পাঠ-৩: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন	পাঠ-১১: অসহযোগ আন্দোলন, মার্চ ১৯৭১
পাঠ-৪: ১৯৫৬ সালের সংবিধান	পাঠ-১২: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
পাঠ-৫: ১৯৫৮ এর সামরিক শাসন	পাঠ-১৩: মুজিবনগর সরকার
পাঠ-৬: ১৯৬৬ সালের ৬ দফা	পাঠ-১৪: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
পাঠ-৭: ছাত্র সমাজের ১১ দফা	পাঠ-১৫: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
পাঠ-৮: ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা	

পাঠ-২.১ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণপরিষদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সামরিক শাসন, ৬ দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, চূড়ান্ত বিজয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যার একটির নাম পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান। এক হাজার মাইলের অধিক দূরত্ব ছিল

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৬.২৭%। দু-অংশের মধ্যে জলবায়ু, সমাজ কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা, জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি কোন কিছুতে মিল ছিল না।

ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলভিত্তি। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে উলেমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণ দাবি করেন যে, পাকিস্তানকে এমন একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ষোষণা করা হোক, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র শাসিত হবে এবং রাষ্ট্র প্রধানকে আমীল বা খলিফার মত অসীম ক্ষমতা দেয়া হবে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অধিকাংশ সদস্য 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নামকরণ সমর্থন করলেও পাকিস্তানকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবে। পাশাপাশি বলা হয় যে, এ রাষ্ট্রে ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা পুরোপুরি মেনে চলা হবে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার সুবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বৃহৎ অংশ এবং বড় বড় প্রকল্পগুলো মূলত: পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সামরিক হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে করা হয়। এসবের ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তান ছিল একটি যুক্তরাষ্ট্র। আর এ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হবার কথা ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রস্তাব ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ভৌগলিক বিবেচনায় থেকেও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির হওয়ার কথা থাকলেও শাসকবর্গের মধ্যে ছিল এককেন্দ্রিক প্রবণতা। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল না। বরং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বললেই এর প্রবক্তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বা ভারতের গুপ্তচর হিসাবে প্রচার করা হত।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পর সংবিধান প্রণয়ন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ণে দীর্ঘ নয় বছর লেগে গিয়েছিল। উপরন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঙ্গালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে। তারা বাঙালির ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙালি বনাম অবাঙালি দ্বণ্ড প্রকট হয়ে দেখা দেয়। একে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনীতি আবর্তিত হয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি ঘটে। ব্রিটিশ আমলের শাসকদের কাছ থেকে পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে শক্তিশালী সামরিক-বেসামারিক আমলাতন্ত্র পায়। পক্ষান্তরে এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এ অবস্থা পাকিস্তানে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা হয়ে উঠেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হন। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তার নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান থাকার কথা থাকলেও তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর পরিবর্তে জিন্নাহর প্রতি বেশী অনুগত ছিলেন। ফলে পাকিস্তানে প্রকৃত অর্থে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক-বেসামরিক আমলারা এটা মেনে নিতে পারেনি। বরঞ্চ কিভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে তার ষড়যন্ত্র শুরু করে। পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ২৩ বছরের মাথায় ১৯৭০ সালে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

বস্তুত পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোটি কোনভাবেই গণতান্ত্রিক ছিল না। এটি ছিল এমন একটি রাষ্ট্র যা সামরিক-বেসামরিক শাসক দ্বারা পরিচালিত হত। ক্রমাগত অন্যায়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে জাতীয় সংহতি কখনোই গড়ে উঠেনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় যার একটির নাম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। এই ধারাবাহিকতাতে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাকিস্তানে কত সালে সংবিধান প্রণয়ন হয় ?

(ক) ১৯৫৪ (খ) ১৯৫৫

(গ) ১৯৫৬ (ঘ) ১৯৬০

২। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের নিচের কোন দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে?

(ক) শিল্প কারখান গড়া (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

(গ) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা (ঘ) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

একটি রাষ্ট্রের 'ক' অঞ্চল 'খ' অঞ্চলের উপরে নিপীড়ন চালায়। 'খ' অঞ্চলকে সকল ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে এসে 'খ' অঞ্চলের জনগণ এই অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধিকারের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের 'খ' অঞ্চলের সাথে কোন দেশের মিল আছে?

ক. বাংলাদেশ খ) ব্রিটেন গ) রাশিয়া ঘ) পোল্যান্ড

পাঠ-২.২ ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-১৯৫২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতা, বাংলা ভাষা, স্বাধিকার, জাতীয়তাবাদ, চেতনা

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলার জনগণের স্বাধিকার আদায়ের পদক্ষেপের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু হয়। প্রথমে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। তারা বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা"। এ ঘোষনার পর পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য তারা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমউদ্দিন জিন্নাহর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। ফলে ছাত্র-সমাজ তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট আহবান ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। পুলিশ ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, সফিউর, জব্বারসহ কয়েকজন শহীদ হন। হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব বাংলা। শুরু হয় মাতৃভাষার অধিকার আদায় ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। অবশেষে বাঙালি জাতি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও এর রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল স্থান দখল করে আছে। জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১. **স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ :** ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বাঙালি জনগণকে এ ধারণা প্রদান করে যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র স্বার্থ এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

২. **বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ :** ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে ধর্মের মিল ছাড়া বাঙালীদের যে আর কোন বন্ধন নেই, তা তারা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করে। ১৯৫২ সালে আত্মাহুতির মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়, সেই চেতনার পথ ধরে ১৯৫৪ এর নির্বাচনে ২১ দফার জয় হয়, বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়।

৩. **জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি :** বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধ সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. **পরবর্তী আন্দোলনে প্রভাব :** ১৯৫২ পরবর্তী পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক আন্দোলন ভাষা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, ঊনসত্তরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানসহ বাঙালির প্রত্যেকটি আন্দোলনের ভিত্তিমূল হচ্ছে ভাষা আন্দোলন।

৫. **অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা:** ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাদের মধ্যে নায্য দাবী উত্থানে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের বোধ জাগিয়ে তোলে।

৬. **ছাত্র-সমাজের গুরুত্ব:** এ আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। পরবর্তীতে ছাত্ররাই রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাঙালি জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। এ দিন ১৮৮টি দেশ ইউনেস্কোর ৩১তম সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ক্রমাগত আন্দোলন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি কে উথাপন করেন?

ক) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

(গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মোহন তার বন্ধু মাশরাফিকে জন্মদিনে মোবাইলের মাধ্যমে ইংরেজীতে শুভ জন্মদিন পাঠায়। বার্তাটিতে লেখা থাকে "Happy Birthday" বার্তাটি পড়ে মাশরাফি আহত বোধ করে। তাঁর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ে।

২। মাশরাফির কোন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ে ?

(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

(গ) ছয় দফা কর্মসূচি (ঘ) মহান মুক্তিযুদ্ধ

পাঠ-২.৩ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ২১ দফা, পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী, অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নির্বাচনের ফলে ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় হয় এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। আর এ জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিমাতা সূলভ আচরণ শুরু করে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতা ও উন্নয়ন নানাভাবে ব্যাহত হয়। পূর্ব বাংলার জনগনের মধ্যে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালের পর ১৯৫১ সালে প্রদেশগুলোতে নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন দিলেও পূর্ব বাংলাতে নির্বাচন দেয়নি। এর কারণ মুসলিম লীগের সম্ভাব্য পরাজয়ের ভয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে কয়েকটি উপনির্বাচনে পরাজয়ে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল একজোট হয়ে ২১ দফা কর্মসুচিকে নিয়ে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

১. বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা।
২. বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন, ভূমি রাজস্বকে ন্যায় সঙ্গত স্তরে নামিয়ে আনা এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল।
৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান। মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেংকারির তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
৫. পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কুটির ও বৃহৎ পর্যায়ে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা।
৬. অবিলম্বে বাস্তুহারাদের পুনর্বহাল।
৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা।
৮. পূর্ব বাংলার শিল্পায়তন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।
৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা।
১০. সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিভেদ বিলোপ করে শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠন।
১১. বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কালাকানুন বাতিল করে পূর্ন স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ ও কর্মচারীদের বেতনের সামাঞ্জস্য বিধান। মন্ত্রীদের সর্বোচ্চ বেতন এক হাজার টাকা।
১৩. ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ ও ১৯৪০ সাল থেকে অর্জিত অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।
১৪. সকল নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা বিধান।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ।
১৬. বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা সাহিত্যের গবেষণাগারে রূপান্তর।
১৭. বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ।
১৮. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, পূর্ব বাংলাতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন, অস্ত্র কারখানা নির্মাণ এবং আনসার বাহিনীকে মিলিশিয়া বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।
১৯. আইন সভার আয়ু বর্ধিত না করা। সাধারণ নির্বাচনের ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
২০. আইন সভার শূণ্য আসন তিন মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে মুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি মুসলিম আসন লাভ করে; এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩টি আসন লাভ করে। অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কমিউনিষ্ট পার্টি ৪টি, নির্দলীয় সদস্যগণ ১টি আসন লাভ করে। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ১৯৩৭ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা মুসলিম লীগ মাত্র ৭টি আসন পায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এই বিজয় ছিল মূলত বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিজয়। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার ফসলই হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসাম্প্রাদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রতীক ছিল নৌকা । নদীমাতৃক পূর্ব বাংলায় সাধারণ মানুষ নৌকা প্রতীককে তাদের পরিচিত প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগের রাজনীতির বিদায় বার্তা ঘোষিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা য়ায় যে, বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য নিজের ভাষায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে গণরায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় মানুষের ভাষা ও ভূ-খন্ডগত স্বতন্ত্র চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। পূর্ব বাংলা সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার আদায়ে লড়াই চালাতে প্রস্তুত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি কি ছিল?

(ক) ছয় দফা (খ) ১১ দফা

(গ) ১০ দফা (ঘ) ২১ দফা।

২। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কি ছিল?

(ক) গোলাপ ফুল (খ) হারিকেন

(গ) নৌকা (ঘ) ঘড়ি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

হাসিব ও রাকিব একটি বই নিয়ে আলোচনা করছিল। সেখানে তারা নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি দলের নির্বাচনে জয়লাভের কথা বলছিল। সেখানে অন্য একটি দলের নির্বাচনে ভরাডুবি ঘটে।

৩। কোন দলটির ভরাডুবির কথা বলা হয়েছে?

i) আওয়ামী লীগ

ii) যুক্তফ্রন্ট

iii) মুসলিম লীগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-২.৪ ১৯৫৬ সালের সংবিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণপরিষদ, সংবিধান, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক কাঠামো, দলীয় স্বার্থ, জনগণের অংশগ্রহণ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়। বিলটি ২১ জানুয়ারি গণপরিষদে গৃহীত হয়। ২ মার্চ গর্ভনর জেনারেল এ বিলে সম্মতি প্রদান করেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রণীত এ সংবিধান ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। স্মরণীয় বিষয় এই যে, ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দীর্ঘ নয় বছর সময় নেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র: পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র। এখানে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণীত হবে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার: এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বন্টন নীতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল।

৩. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা: এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন হলেও কেন্দ্র ও প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে।

৪. লিখিত সংবিধান: ১০৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী লিখিত এ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১৩টি অংশ, ৬টি তালিকা, ২৩৪টি ধারা সন্নিবেশিত ছিল।

৫. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: এ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। জাতীয় পরিষদের সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংশোধনী বিল উত্থাপন করে তা পাস করতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।

৬. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন করা হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান এবং সংসদীয় যেকোন আইনকে সংবিধান সম্মত নয় বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা এ আদালতকে প্রদান করা হয়।

৭. সংসদীয় সরকার: এ সংবিধান কেন্দ্র ও প্রদেশে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করে। সংবিধান মোতাবেক আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করবে এবং তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে।

৮. মৌলিক অধিকার: সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত করা হয়। মৌলিক অধিকারগুলোকে আদালতের আওতাভূক্ত করা হয়, তবে জরুরি অবস্থা চলাকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মৌলিক অধিকার রহিত করার বিধান রাখা হয়।

৯. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ: এ সংবিধানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১০. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র: ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতির ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়।

১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল তা মাত্র আট মাস স্থায়ী হয়। ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অব:) ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন এবং সংবিধান বাতিল করেন। নিচে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল:

১. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপ্সা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপ্সার কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রহসনে পরিণত হয়। ফলে এ সংবিধানে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারেনি।

২. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনীহা: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্ষমতার মোহ, দলটির ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়া, নির্বাচন হলে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

৩. সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি: সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সফল করে তোলার জন্য সুসংগঠিত রাজনেতিক দল বিকশিত না হওয়ায় এ সংবিধান কার্যকর হতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সংগঠনে।

৪. উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা: ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আইন পরিষদের শূণ্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানে গড়িমসি করতে থাকে।

৫. সহনশীলতার অভাব: সহনশীলতার অভাবে সংবিধান কার্যকর হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর উপর আক্রমণ ছিল সহনশীলতার অভাবের বাস্তব চিত্র।

এছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব, সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মন্ত্রিসভার কার্যক্রমে অহেতুক হস্তক্ষেপ, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৬ সালের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রায় দশ বছরের ব্যবধানে ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়। বিলটি গণপরিষদে ২১ জানুয়ারি গৃহীত হয় এবং ২ মার্চ গর্ভনর জেনারেল এ বিলে সম্মতি প্রদান করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ সংবিধান ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ সংবিধান কার্যকর করা হয়?

(ক) ঢাকা প্রস্তাব (খ) লাহোর প্রস্তাব

(গ) ভারত প্রস্তাব (ঘ) পাকিস্তান প্রস্তাব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সজিব ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পড়ছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পড়তে গিয়ে সে দেখতে পায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে যখন আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছিলাম, তখন পাকিস্তানে একটি সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল।

২। এখানে কোন সংবিধানের কথা বলা হয়েছে?

i) ১৯৫৬ সালের সংবিধান

ii) ১৯৫৮ সালের সংবিধান

iii) ১৯৬২ সালের সংবিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-২.৫ ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ জানতে পারবেন।
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, সামরিক শাসন, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সহযোগিতায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে কার্যকর হওয়া সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ৮ অক্টোবর ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। একই তারিখে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অক্টোবর মাসেরই ২৭ তারিখে ইস্কান্দার মীর্জাকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেন আইয়ুব খান।

সামরিক শাসন জারির বাস্তবতা

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কুফল ছিল সুদূর প্রসারী। সামরিক সরকার জনগণের মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে অস্ত্রের মুখে দেশ পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন। সামরিক সরকার জনগণের অনুভূতিকে বুঝতে না পেরে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির কারণগুলো নিম্নরূপ :

১। **সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব :** ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানে সংগঠিত কোন রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মুসলিম লীগ কিছু নেতার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগেরও তখন জাতীয় ভিত্তিক কোন ইমেজ তৈরি হয়নি। তাই অসংগঠিত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার কারণে বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও সেনা বাহিনী রাজনীতিতে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে সক্ষম হয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেও, এর বিরুদ্ধে শুরুতে তেমন কোন সাংগঠনিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি।

২। **মুসলিম লীগের দুর্বল অবস্থা:** পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করার পরিবর্তে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের নিকট মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। এর জন্য জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভাব দেখা যায়। ফলে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলে আগ্রহী করে তোলে।

৩। **সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া:** পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর কখনই সময়মতো নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে মুসলিম লীগ শূণ্য হওয়া আসনে উপনির্বাচন দিতে ভীত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী এ সুযোগ গ্রহণ করে।

৪। **সেনাবাহিনীর ক্ষমতা লাভের বাসনা:** পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিশেষ করে সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছিলেন। সামরিক শাসন জারির বৈধতা দাবী করে ইস্কান্দার মীর্জা বলেন "আমি একজন নীরব দর্শক হিসেবে দেশ ধ্বংসের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারি না"। মূলত ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে কতিপয় ক্ষমতালোভী সামরিক কর্মকর্তার পরিকল্পিত ইচ্ছার বাস্তবায়ন।

৫। **গর্ভনর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ:** ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল অযাচিতভাবে মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এবং ইস্কান্দার মির্জার ষড়যন্ত্র, মন্ত্রিসভা ও আইন সভার কাজে অন্যায় হস্তক্ষেপ পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

৬। **১৯৫৯ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে ভীতি:** পাকিস্তানে প্রস্তাবিত ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ সম্ভাবনা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে শঙ্কিত করে তোলে। সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পশ্চিমা গোষ্ঠী নির্বাচনকে বানচাল করার ব্যবস্থা করে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের প্রভাব বা ফলাফল

১। **একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা:** সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন। তিনি এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেন যাতে করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। **সামরিক আইন জারির ধারা সূচনা:** ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির ফলে পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র এবং সামরিক আইন জারির ধারা সূচিত হয়। যার ফলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি অব্যাহত থাকে। তাছাড়া উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ে।

৩। **সংবিধান বাতিল:** ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন।

৪। **সরকার বিরোধী আন্দোলন:** সামরিক সরকার একটি বেসামরিক প্রক্রিয়ায় দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। কিন্তু আইয়ুব সরকার বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমে ব্যর্থ হয়। 'ছয় দফা' কে কেন্দ্র করে বাঙালিরা একত্রিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে 'আগরতলা মামলা' দায়ের করা হয়। এর প্রতিবাদে বিশাল এক গণঅভ্যুত্থান হয়।

৫। **রাজনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা:** আইয়ুব সরকার মৌলিক গণতন্ত্র নামে গণতন্ত্র নস্যাৎকারী এক অভিনব রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার চালু করেন।

৬। **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ:** ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানে। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আর্বতে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির কারণ কি?

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পর হলেও ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় নানাবিধ দুর্বলতার কারণে ১৯৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর হয়নি। ১৯৫৮ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেন আইয়ুব খান। আইয়ুব খান এক দশকের অধিক সময় ধরে অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তান শাসন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা কে ছিলেন ?

(ক) ইস্কান্দার মির্জা (খ) আইয়ুব খান

(গ) ইয়াহিয়া খান (ঘ) জুলফিকার আলী ভূট্টো

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন। বেশ কয়েক বছর আগে 'ক' দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। টানা হরতাল-অবরোধে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। ব্যবসায়ীরাও এ কারণে ব্যাপক লোকসানের শিকার হন। রাজনৈতিক দলগুলোর মতবিরোধই ছিল ঐ পরিস্থিতির কারণ।

২। উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের কারণ ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কোন কারণের সাথে তুলনীয় ?

(ক) জাতীয় নেতৃত্বের শূণ্যতা (খ) রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্য

(গ) সামরিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি (ঘ) নেতৃবৃন্দের সহনশীলতার অভাব

৩। উদ্দীপকের পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট অরাজকতা দমনে প্রয়োজন-

i) মানুষের মধ্যকার সহনশীলতা বৃদ্ধি করা

ii) সকল প্রকার মতবিরোধ দূর করা

ii) জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৬ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রের স্বরূপ, স্বায়ত্বশাসন, জাতীয়তাবাদ, মহান মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা বাঙালি জাতির জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরি হলেও, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দেখানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের এ পরিকল্পিত শোষণের হাতে থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক মুক্তির বাণী তথা 'ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ করেন।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা ছিল ঐতিহাসিক দাবি। বাঙালির বাঁচা-মরার দাবি। এ ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালিদের অধিকারের সনদ যার মধ্যে বাঙালিদের জীবনের দাবি নিহিত ছিল। নিম্নে ছয় দফা কর্মসূচি উল্লেখ করা হল।

১। **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি:** ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা হবে। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির, সর্বদলীয় ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হবে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার জনসংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

২। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত:** বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

৩। **অর্থ ও মুদ্রা:** দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করার ব্যবস্থা থাকবে। এ রকম ব্যবস্থা চালু সম্ভব না হলে দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার না হতে পারে।

৪। **শুল্ক সম্বন্ধীয়:** সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাবে।

৫। **বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা:** বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকার আলাদা আলোচনা বা সম্পর্ক করতে পারবে।

৬। **আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা:** আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আধা-সামরিক বাহিনী বা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে।

'ছয় দফার' গুরুত্ব

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসন দাবির পটভূমিতে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। ছয় দফা আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে বাঙালিদের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনে।

১। **বাঙ্গালির মুক্তির সনদ:** ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি বা মুক্তির সনদ। বাঙালি জাতির ক্রান্তিকালে আপোসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির পথ উন্মোচন করেন।

২। **জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ:** ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই একে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

৩। **অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি:** ছয় দফা'র অন্যতম তাৎপর্য হল অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। এর মাধ্যমে বাঙালিরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

৪। **আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন:** ছয় দফা কর্মসূচিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছিল। দীর্ঘদিন শাসক চক্রের শোষণের যাঁতাকলে পৃষ্ট পূর্ব বাংলার জনগণ ছয়-দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, জেগে উঠেছিল কঠিন প্রতিজ্ঞায়।

৫। **১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান:** ছয়দফা আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আইয়ুব খান 'আগরতলা মামলা' দায়ের করেন। এর প্রতিবাদে বাঙালিরা গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনই পরবর্তীতে ১৯৬৯ এর অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়।

৬। **মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্খার প্রতীক:** ছয় দফা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাই এ আন্দোলনের পশ্চাতে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী, বিকাশমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, সরকারি কর্মকর্তা এবং ছাত্র-জনতার সমর্থন ছিল স্বত:স্ফূর্ত। সময়ের পরিক্রমাতে ছয় দফা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে আবির্ভূত হয়।।

৭। **সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবার অনুপ্রেরণা:** ছয় দফা দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয় শাসক গোষ্ঠী। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিরা পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয় দফা কী ? ছয় দফার গুরুত্ব বর্ণনা করুন?

সারসংক্ষেপ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছয় দফার প্রভাব ও গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। ছয় দফা বাঙালি জাতির বাঁচা-মরার দাবি। ছয় দফার পথ ধরেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৬৬ কত তারিখে উথাপিত হয় ?

(ক) ৫ ফ্রেব্রুয়ারি (খ) ৬ ফ্রেব্রুয়ারি

(গ) ৭ ফ্রেব্রুয়ারি (ঘ) ৮ ফ্রেব্রুয়ারি

২। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। একে তিনি পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি বলে ঘোষণা করেন।

কর্মসূচিটি হল-

(ক) ৬ দফা কর্মসূচি

(খ) ১১ দফা কর্মসূচি

(গ) ৮ দফা কর্মসূচি

৩। বাঙালির 'মুক্তির সনদ' কোনটি?

(ক) দ্বিজাতি তত্ত্ব (খ) ১৯৫৬ সালের সংবিধান

(গ) মৌলিক গণতন্ত্র (ঘ) ছয় দফা কর্মসূচি

পাঠ-২.৭ ছাত্র সমাজের ১১ দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছাত্র সমাজের এগার দফা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এগার দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, গণজাগরণ, ছাত্র সমাজ

ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯৬৯ সালের ছাত্র-সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার জনপ্রিয়তা দেখে আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এ মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমাজ আইয়ুব বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৮ সালের ৫ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ (দোলন গ্রুপ) এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ডাকসুর তৎকালীন ভিপি ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদে আরো নেতৃত্ব প্রদান করেন মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ। ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি নিম্নরূপ:-

১. বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিল, শিক্ষা ব্যয় হ্রাস, অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু, নারী শিক্ষা প্রসার।
২. সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
৩. ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
৪. বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে নিয়ে সাব-ফেডারেশন গঠন।
৫. ব্যাংক, বীমা, পাট, ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ।
৬. কৃষকের খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করা, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল। পাটের দাম মন প্রতি সর্বনিম্ন ৪০ টাকা ও আখের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ।
৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান এবং শিল্প, বাসস্থান চিকিৎসা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা।
৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।
৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।
১০. সিয়াটো-সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলপূর্বক জোট বর্হিভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম।
১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক, রাজনৈতিককর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া এবং আগরতলা মামলাসহ রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার।

১১ দফা দাবির গুরুত্ব

ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচিতে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১১ দফা দাবি এবং ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুধু ছাত্র সমাজের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল না। ১১ দফা এক পর্যায়ে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়। ১১ দফার মূল লক্ষ্য ছিল কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি জনগণের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা। ১১ দফা দাবি উদ্ভূত গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতে সরকার বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের মুক্তি দেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার করে। সর্বোপরি, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১১ দফা দাবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির বদৌলতে শাসক চক্রের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ গণবিক্ষোভে রুপান্তরিত হয়। বিক্ষোভ দমনে সরকার যতই নির্যাতন বৃদ্ধি করতে থাকে ততই আন্দোলনরত জনগণ মরিয়া হয়ে উঠতে থাকে। ১১ দফা কর্মসূচির কারণেই ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন সংঘটিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এগারো দফা দাবি মূলত কাদের ছিল?

(ক) ছাত্র সমাজের (খ) বুদ্ধিজীবি সমাজের

(গ) কৃষক সমাজের (ঘ) শ্রমিক সমাজের

২। ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি ছিল-

(ক) আইয়ুব খান বিরোধী (খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো বিরোধী

(গ) খাজা নাজিম উদ্দিন বিরোধী (ঘ) ইয়াহিয়া খান বিরোধী

৩। ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রিয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি কে ছিলেন?

(ক) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (খ) তোফায়েল আহমেদ

(গ) শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক

পাঠ-২.৮ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, ১৯৬৮

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এই পাঠ শেষে আপনি আগরতলা মামলার কারণ জানতে পারবেন।
- আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	ঐতিহাসিক মামলা, বৈঠক, আন্দোলন, অভ্যুত্থান, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কালো অধ্যায়।

আগরতলা মামলা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছয় দফা ভিত্তিক বাঙালির জাতীয় চেতনাকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য জেনারেল আইয়ুব খান ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেন। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফাকে নস্যাৎ করাই এই ষড়যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলাকে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। মামলায় বলা হয় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগিরা ভারতের আগরতলায় গোপন বৈঠকে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শাসক গোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা' মামলা দায়ের করে। এই মামলায় বলা হয় ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারী শেখ মুজিবুর রহমান। অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় যোগসাজসে এবং ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিল।

এই মামলায় ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সাবেক বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে। কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় ''রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যদের মামলা'' এর বিচার শুরু হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেল সম্পূর্ণ মামলাটিই ছিল হীন ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধুকে এহেন মিথ্যা মামলায় জড়ানোর প্রেক্ষিতে পূর্ব-বাংলার জনগণের মনে দারুন ক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্র-জনতা তাঁর মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে গণ আন্দোলনের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল ব্যক্তিদের নি:শর্ত মুক্তি প্রদানের ঘোষণা দেন।

আগরতলা মামলার কারণ

বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করাই ছিল আগরতলা মামলার প্রত্যক্ষ ও সুদূর প্রসারী লক্ষ্য।

ক্ষমতা দখলের প্রথম কয়েক বছর প্রচন্ড প্রতাপে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকেন আইয়ুব খান। তবে আস্তে-আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ক্রমশ আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী প্রথম বড় ধরণের আন্দোলন। এরপরে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানি আইয়ুব বিরোধীরা জোটবদ্ধ হয় এবং ছাত্ররা আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। তাসখন্দ চুক্তির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও আইয়ুবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার আন্দোলনে আইয়ুবের ক্ষমতার ভিত অনেকটা নড়বড়ে হয়ে যায়। এভাবে পাকিস্তানে উভয় অঞ্চলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। আইয়ুব খান তার কর্তৃত্বকে অক্ষুণ রাখার জন্য এ সকল আন্দোলন দমন করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। আর এটা ছিল আগরতলা মামলা সাজানোর অন্যতম কারণ।

মামলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে অভিযুক্তদের প্রকাশ্য বিচারের দাবি করা হয়। ১৯ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালিত হয়। জেনারেল আইয়ুব খান আশা করেছিলেন আগরতলা মামলার দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। কিন্তু তার এই আশা করাটা আত্মঘাতী হয়েছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দাবি পেশ করে। তাদের ১১ দফা দাবির মধ্যে একটা ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার। আগরতলা মামলার আসামি জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে গুলি করে হত্যা করা হয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসাদুজ্জামান নিহত হলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয় ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলকে মুক্তি প্রদান করে।

আগরতলা মামলার ফলাফল

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারের দমন নীতির কারণে উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের অনুপস্থিতিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সরকারের নিকট ১১ দফা দাবি পেশ করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির প্রতি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সমর্থন দেয়। ফলে ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলন অচিরেই গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। ১১ দফা দাবির অন্যতম দাবি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলের নি:শর্ত মুক্তি। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জনতার উপস্থিতিতে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আগরতলা মামলায় জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভীত দুর্বল হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন না দেয়ার জন্য জেনারেল আইয়ুব ও তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী নানা রকম কূটকৌশল নিয়েও সফল হতে পারেনি, বাঙালিদের আন্দোলনের প্রাবাল্যে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাকিস্তানী শাসকেরা কেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিল?

সারসংক্ষেপ

আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে জনগণের মনে অবিশ্বাস গড়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে নিশ্চিহ্ন করা। কিন্তু ফলাফল হয়েছিল বিপরীত। জনগণ বুঝতে পেরেছিল মামলাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মিথ্যা ও বানোয়াট। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আগরতলা মামলার আসামি ছিল কয়জন ?

(ক) ৩০ জন (খ) ৩২ জন

(গ) ৩৬ জন (ঘ) ৩৫ জন

২। আগরতলা মামলার কোন আসামিকে সেনানিবাসে হত্যা করা হয়েছিল?

(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) তোফায়েল আহমেদ

(গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক (ঘ) আব্দুর রাজ্জাক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনগণের ন্যায্য অধিকারের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের জনপ্রিয় একজন নেতাকে বারবার কারাভোগ করতে হয়। এক পর্যায়ে নেতাকে ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার করা হলে জনগণ আন্দোলন করে তাঁকে মুক্ত করে।

৩। উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নেতা হচ্ছেন-

(ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (খ) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলনের সরাসরি ফল-

i) আইয়ুব খানের পতন

ii) ১৯৭০ সালের নির্বাচন দিতে বাধ্য করা

iii) মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৫। কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়?

(ক) ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি (খ) ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

(গ) ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি

পাঠ-২.৯ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ বলতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈষম্য, মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা, স্বায়ত্তশাসন

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম সোপান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলার জনগণ শোষিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নাম দেয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে ও ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব সরকারের এক দশক স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'উন্নয়ন দশক' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাঙালিদের কাছে এটা ছিল প্রহসন। কারণ আইয়ুবের দশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এটা মেনে নিতে পারেনি। তাদের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না। তারা আন্দোলন করে আইয়ুব খানের বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে, আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে, ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে গণআন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয়।

গণঅভ্যুত্থানের কারণ

১. **বৈষম্যনীতি:** আইয়ুব সরকার সব সময় দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য নীতি প্রয়োগ করে। বস্তত: পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই এই বৈষম্য চলতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় রাজধানী ছিল করাচী। আইয়ুব সরকার রাজধানী পরিবর্তন করেন ইসলামাবাদ। এ শহরের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়েছিল বিপুল অঙ্কের অর্থ । আর পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয় নামে মাত্র অর্থ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল প্রবল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল।

২. **মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না। এর ফলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভূমিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জনগণের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সর্বত্র জনগণ সরকার পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার হয় এবং তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ গণঅভ্যুত্থান ঘটায়।

৩. **সামরিক শাসন:** ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাজনীতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছিলেন। বাংলা ভাষা, বাংলা বর্ণ, রবীন্দ্র সঙ্গীতসহ বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিকে আঘাত হেনে বাংলাকে একটি সাম্প্রদায়িক অঞ্চলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

৪. **আগরতলা মামলা :** ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান আটককৃত অবস্থায় পাকিস্তান সরকার মামলা দায়ের করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। হরতাল, বিক্ষোভ, আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানকে উত্তাল করে তোলে।

৫. **স্বায়ত্তশাসনের দাবি:** ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে উদাসীনতা দেখিয়েছিল তার প্রতিক্রিয়াতে পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলে। এ কারণে পশ্চিম

পাকিস্তানীরা শেখ মুজিবসহ শত-শত নেতা-কর্মীকে আটকে রেখে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছিল। এতে করে আন্দোলন আরও কঠোর রূপ ধারণ করে।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নামে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতার একজন নেতার মৃত্যু হলে আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে। আসাদ হত্যার পরিণতিতে পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। এর আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড: সামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর বেয়নেট চার্জে মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তান সরকার নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে আন্দোলন রুদ্ধ করতে গিয়ে এর গতি আরো তীব্র করে তোলে। ফলে গণঅভ্যুত্থান হয়ে পড়ে অবধারিত।

গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গণআন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতা জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। জনগণ সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় আইয়ুব সরকার জনগণের নিকট নতি স্বীকার করে এবং ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি সর্বদলীয় গোল টেবিল বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন। এ গোলটবিল বৈঠকে তিনটি বিষয়ে নেতৃবর্গ ঐক্যমত্যে পৌঁছান। যথা- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।

এই অভ্যুত্থানের ফলে মিথ্যা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয় সরকার। এ আন্দোলনের ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির প্রধান নেতায় পরিণত হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের চূড়ান্ত পরিণতির একটি ধাপ। এই আন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করলে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক সংবর্ধনা সভায় তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আইয়ুব খানের দমন-পীড়ন বাঙালিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এই গণঅভ্যুত্থানের ধারাবহিকতারই সর্বোচ্চ প্রকাশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আসাদকে কত তারিখে হত্যা করা হয়?

ক) ১৯ জানুয়ারি খ) ২০ জানুয়ারি গ) ২১ জানুয়ারি ঘ) ২২ জানুয়ারি

২। সর্বদলীয় গোলটেবিল কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়?

ক) জানুয়ারি খ) ফেব্রুয়ারি গ) মার্চ ঘ) এপ্রিল

পাঠ-২.১০ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুধাবন করতে পারবেন।
- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র বিষয়ে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	গণআন্দোলন, আইনগত কাঠামো, সার্বজনীন ভোটাধিকার, সামরিক শাসন, প্রাথমিক রিপোর্ট, ষড়যন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ

১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ সালের উপর্যুপরি আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের অবস্থা ক্রমশ নাজুক হতে থাকে। ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারিতে গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। তিনিও সামরিক শাসন জারি করেন। একই সাথে ঘোষণা করেন, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধি 'আইনগত কাঠামো আদেশ' বা এলএফও ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয় ৫ অক্টোবর। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ২২ অক্টোবর স্থির হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে প্রবল ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। জলোচ্ছ্বাস প্লাবিত এলাকাগুলোতে ১৯৭১ সালের ১৭ জনুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০ এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৩।

নির্বাচনের ফলাফল

৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি আসনের ১৬০ টিতে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ । বাকি দুটির একটিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নূরুল আমিন এবং অপরটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জয়ী হন। আওয়ামী লীগের এই ১৬০ টি আসনের সাথে যুক্ত হয় সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসন। ফলে আওয়ামী লীগের মোট আসন দাঁড়ায় ১৬৭; অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোন প্রার্থী দেয়নি। অন্যদিকে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। এ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করেনি।

১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের সংবাদ সর্বপ্রথম ১৪ তারিখে খবরের কাগজে আসে। দিনে-দিনে এর ভয়াবহতা উন্মোচিত হতে থাকে। যা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে সারা বিশ্ব। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ছুটে আসতে থাকে ত্রাণ কর্মীরা। কিন্তু আসে না শুধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রাণ সাহায্য দূরের কথা সরকারের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাতেও কেউ আসে নি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতারাও এলেন না, মাত্র একজন ছাড়া। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের এই হৃদয়হীন আচরণ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের মনে চরম বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। বিতৃষ্ণা ঘৃণায় পরিণত হল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জীবনহানি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক রিপোর্ট দেখে।

ওই রিপোর্টে মৃতের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ বলা হল। গভর্নর এস এম আহসানের সংবাদ সম্মেলন বাঙালি মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্য তিনি হেলিকপ্টার চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু তাঁকে বিমুখ করা হয়। ১৯৭০ সালের ২৩ নভেম্বর গভর্নর হাউসে (স্বাধীনতার পর বঙ্গভবন) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, হেলিকপ্টার চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায় নি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের এই আচরণে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব ঘূর্ণিদূর্গত এলাকা সফর শেষে এক বিবৃতিতে জানান, সরকার প্রতিটি পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আবহাওয়া উপগ্রহ মারফত আগাম তথ্য পাওয়া সত্ত্বেও ঘূর্ণিঝড় কবলিত উপকূলীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা ও উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ঘূর্ণিঝড়ের পর মৃতের সংখ্যা অথবা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণেরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হাতে এভাবে ভরাডুবি ভাবতে পারেনি পাকিস্তান সরকার। এমতাবস্থায়, ক্ষমতা হস্তান্তর না করার লক্ষ্যে শুরু হয়ে যায় ষড়যন্ত্র। পরবর্তীকালে অনেক পাকিস্তানী এই ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির দুই দশকের মাথায় পাকিস্তানি ইংরেজি দৈনিক দ্য ডন ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই ভাঙন নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বলা হয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার মুহূর্ত থেকে আওয়ামী লীগকে তার অর্জিত বিজয়ের সুফল ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র শুরু হয় আওয়ামী লীগের বিজয় নিয়ে অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে। জামায়াতে ইসলামি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত এ দলের একটি পত্রিকা ঢাকা থেকে পাঠানো এক রিপোর্টে লেখে, 'শেখ মুজিবের জয়লাভে হিন্দু নর-নারীরা উল্লাসে নেচেছে, গান করেছে।' অপপ্রচার এখানেই থেমে থাকেনি। এক পর্যায়ে বলা হয়, আওয়ামী লীগের লোকেরা মুসলমান নয়। ইসলামের চেয়ে হিন্দুদের প্রতি আওয়ামী লীগের টান বেশি।

নির্বাচনী ফলাফল সেনাবাহিনীর মতোই পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। ভুট্টো ধরেই নিয়েছিলেন তার পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে । তিনিই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এই আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে দিল একজন বাঙালি যার নাম শেখ মুজিব! বাঙালি মুজিবের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টে বিরোধীদলের নেতার আসনে তিনি বসেন কী করে? সুতরাং তিনি নেমে পড়লেন ষড়যন্ত্রে। আর তাঁর সাথে হাত মেলালো সামরিক শক্তি। এহেন বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রের দ্বারা বাতিল করা হল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল না বাঙালির হাতে। বরং আলোচনার নামে প্রহসন চালিয়ে ২৫ মার্চের রাত্রে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে অসংখ্য নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব ও প্রভাব

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটাই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনটি ছিল প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। পক্ষান্তরে, ১৯৭০ এর নির্বাচন ছিল একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য এ নির্বাচন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা শাসকদের বৈষম্য-নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করার মাধ্যমে জনগণ প্রমাণ করে যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফার দাবি সঠিক ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে পাকিস্তান নামেই কেবল একটি অখন্ড রাষ্ট্র। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন ঐক্য সংহতি বা মতের মিল কিছুই নেই। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধতা প্রমাণিত হয়। আওয়ামী লীগকে একচেটিয়াভাবে ভোটদানের মাধ্যমে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে জনগণ প্রমাণ করে যে তারা একতাবদ্ধ। জনগণ জানিয়ে দেয় যে, তারা সকল রকম বঞ্চনা আর শোষণের অবসান চায়। এটি ছিল পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের পর নানামুখি ষড়যন্ত্র, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরও পাকিস্তানিরা টিকে থাকতে পারেনি। বাঙালির আত্মপ্রত্যয় আর দেশপ্রেমের কাছে হার মেনে আত্মসমর্পণ করে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৪ বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে বাঙালির বিপুল বিজয় তাদের ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে এনে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে আসেনি। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন শেষাবধি স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিযে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। শেষাবধি ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কত আসন লাভ করে ?

(ক) ১৫৫ (খ) ১৬০

(গ) ১৭০ (ঘ) ১৪০

২। ১৯৭০ সালে পিপিপির নেতা কে ছিলেন?

(ক) জুলফিকার আলী ভূট্টো (খ) আইয়ুব খান

(গ) নুরুল আমিন (ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল-	প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ-	১৬৭
পিপলস পার্টি-	৮৮
অন্যান্য-	৫৮
সর্বমোট-	৩১৩

৩। উদ্দীপকে কত সালের নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ?

(ক) ১৯৩৭ (খ) ১৯৪৬

(গ) ১৯৫৪ (ঘ) ১৯৭০

৪। উক্ত নির্বাচনের ফলে-

i. বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়

ii. পাকিস্তানের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়

iii. মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.১১ অসহযোগ আন্দোলন, মার্চ ১৯৭১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনকালীন ঘটনাক্রম জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা হস্তান্তর, সেনাশাসক, জনপ্রতিনিধি, ষড়যন্ত্র

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে তারা জনরায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পাকিস্তানীদের কাছে দাবি জানায়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই আহ্বানের পশ্চাতে গোপনে চলছিল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার ষড়যন্ত্র। হঠাৎ ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেন। কারণ হিসেবে তিনি দেশের মারাত্মক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতা অধিবেশনে অংশ নেবেন না বলে উল্লেখ করেন। এই ঘোষণার পর পর আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, ২৩ বছরের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য বাঙালিরা এখন যে কোন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে তিনি সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।

২ ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। বঙ্গবন্ধু জানান, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। জনমতের ভিত্তিতে ৬ ও ১১ দফার আলোকে সংবিধান রচনার কথাও তিনি পুনরুল্লেখ করেন। ৩ মার্চ ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানের জনসভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে দল মত নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানায়। সভা শেষে লাখ-লাখ জনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নেয়ার শপথ গ্রহণ করে। ছাত্রলীগের ঘোষণায় রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশ করা না হলে তা বর্জনের কথা বলা হয়। এ দিন বঙ্গবন্ধু পুনরায় ক্ষমতা দখলকারী সেনাশাসকদের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেবার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু ৪ মার্চ সরকারি-বেসরকারি যে সকল অফিসে কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হয়নি তাদের বেতন দেবার জন্য এবং ব্যাংক কর্মচারীদের ২.৩০ থেকে ৪.৩০ টা পর্যন্ত ২ দিন ব্যাংক লেনদেনের অনুমতি দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতাল, ফার্মেসি, এ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্র, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ফায়ার সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট খোলা রাখার নির্দেশ দেন।

৫ মার্চ দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতায় পাকিস্তানী শাসকরা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং দেশের প্রধান-প্রধান শহরে কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এতে পরিস্থিতির আরো মারাত্মক অবনতি ঘটে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য এক পর্যায়ে আন্দোলনরত জনতার প্রতি ইয়াহিয়ার দখলদার সরকার গুলি চালাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, ময়মনসিংহসহ নানা স্থানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিপ্লবী জনতার প্রতি গুলি চালাতে অস্বীকার করে।

৬ মার্চ সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় সারাদেশে সংগঠিত আন্দোলনের উপর খবরে বলা হয়, যশোর, খুলনা, রংপুর, টঙ্গী, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, সর্বত্র এক উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়েছে। এই দিন লেখক-শিল্পীবৃন্দ জনতার প্রতি আপোষহীন হবার আহ্বান জানায়। একই দিন ইয়াহিয়া খান তার এক বেতার ভাষণে জনতার আন্দোলনকে দস্যুবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে বক্তব্য দেন। আন্দোলন থামানোর জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। এ দিন রাতে ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে

তাকে কঠোর হাতে আন্দোলন প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানান।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ মানুষের বিশাল জনসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদি ঘোষণা হিসেবে পরিগণিত হয়।

৮ মার্চ সারাদেশে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান সম্বলিত একটি লিফলেট প্রচারিত হয়। এ দিন ছাত্রলীগ এক জরুরি বৈঠকে "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠনের আহ্বান জানায় । সভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নাম পরিবর্তন করে 'ছাত্রলীগ' ব্যবহার করার প্রস্তাব পাস হয়। সভায় সকল স্থানে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো ও উর্দু ছবি প্রদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৯ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন ও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের যে দাবি উত্থাপন করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত। ঐ দিন 'দৈনিক পাকিস্তান' তাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানায়। পত্রিকাটি আরো বলে, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করার আইনগত অধিকার রয়েছে এবং এক্ষেত্রে সকল বাধা দূর হওয়া উচিত।

১০ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার বীর। ভাসানী জনতার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ জানান। এদিন 'দৈনিক পাকিস্তান' অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১১ মার্চ তাজউদ্দিন আহমেদ সাক্ষরিত এক ঘোষণায় বলা হয়, উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় স্বার্থবিরোধী শক্তির মোকাবেলায় বদ্ধপরিকর হতে হবে। দেশের বাইরে কোন অর্থ প্রেরণ করা যাবে না।

১৩ মার্চ একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকা আওয়ামী লীগের দাবি ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়।

১৪ মার্চ পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো করাচির জনসভায় ক্ষমতা দখলকারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ ও পিপিপির হাতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে হস্তান্তরের আবেদন জানান। ১৬ মার্চ পুনরায় এক বিবৃতিতে ভূট্টো বলেন, সংখ্যাভিত্তিক সরকার পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ মার্চ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কোর্ট-কাচারি, স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে। এ দিন কতগুলো নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়, সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং শাখা আপাতত হরতাল পালন করবে ২) বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ৩) জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগণ আইন-শৃংখলা রক্ষা, উন্নয়ন, কর্মকান্ড তদারক করবেন ৪) বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল কাজ করবেন । কিন্তু সৈন্য চলাচল ও অস্ত্রপাতি আনা-নেয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না ৫) আমদানিকৃত মালামাল দ্রুত খালাস করতে হবে। ডাক বিভাগ তাদের কাজ করে যাবে ৬) রেল চালু থাকবে ৭) সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে ই.পি.আর.টি.সি. চালু থাকবে ৮) অভ্যন্তরীণ বন্দরগুলোর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক কর্মচারি কর্মরত থাকবেন ৯) বাংলাদেশের ভেতরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, মানি অর্ডার, পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ডাক ও তার বিভাগ কাজ করবে ১০) হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য সার্ভিস যথারীতি তাদের কাজ করে যাবে।

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের অনুরোধে তাঁর সাথে ঢাকায় এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। ১৮ মার্চ সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত করা হবে। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার এ প্রস্তাব দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তদন্তের ভার এবার তারা নিজেরাই নেবেন।

ইয়াহিয়ার অনুরোধে পুনরায় বঙ্গবন্ধু দেশের চলমান রাজনৈতিক ও শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত অচলাবস্থা নিরসনকল্পে ২০ মার্চ চতুর্থ দফা আলোচনায় মিলিত হন। ইয়াহিয়া খান যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রহসনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর খান সেনারা আকস্মিক হামলা চালায়। ২১ মার্চ পিপিপি প্রধান ভুট্টো হঠাৎ করে ঢাকায় আসেন এবং ইয়াহিয়ার সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

২৩ মার্চ এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সঙ্কট নিরসনের সর্বশেষ সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায়। ২৪ মার্চ স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। ব্রিটেন, ভারত, রাশিয়াসহ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চ ইয়াহিয়া ও ভূট্টো ঢাকা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী নরপশুরা ঢাকাসহ সারাদেশে নিরস্ত্র জনতার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় আবাসিক এলাকা, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানায় ইপিআর বাহিনীর ওপর পাকিস্তানী পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী একযোগে আক্রমণ করে। নিহত হয় অগণিত মানুষ।

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭১ সালের ২-২৫ মার্চ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার পর বাংলার মুক্তিকামী জনগণ স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষায় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৭ই মার্চেও ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের সামগ্রিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ?

(ক) ২৫ মার্চ (খ) ২৬ মার্চ

(গ) ২৭ মাচ (ঘ) ২৮ মার্চ

২। কত তারিখে কবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়?

(ক) ২৩ মার্চ (খ) ২০ মার্চ

(গ) ২২ মাচ (ঘ) ২৫ মার্চ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

'ক' রাষ্ট্রের পূর্ব অঞ্চল শুরু থেকেই পশ্চিম অঞ্চলের শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়নের শিকার। ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এসে পূর্ব অঞ্চলের একটি দল জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর হয় না। এমতাবস্থায় নিপীড়িত জাতিটিকে মুক্ত করার ডাক দেন জাতির প্রধান নেতা।

৩। উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন অংশের মিল আছে?

ক) ভাষা আন্দোলন খ) ছয় দফা

গ) গণঅভ্যুত্থান ঘ) স্বাধীনতা ঘোষণা

৪। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দল কোনটি?

ক) আওয়ামী লীগ খ) মুসলিম লীগ গ) ন্যাপ ঘ) কমিউনিস্ট পার্টি

পাঠ-২.১২ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অসহযোগ আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক ক্ষমতা, ভাষণ, অ্যাসেম্বলি, স্বাধীনতা

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন দেখে। কারণ এটা তাঁদের ন্যায্য অধিকার। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করলেও গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। ১ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হঠাৎই স্থগিত করে। ফলে এতদিনের ধূমায়িত ক্ষোভে বাঙালি বারুদের মতো ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। এই আন্দোলন চলে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত। আর এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ মানুষের এক বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণ দেন। যা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে আখ্যাায়িত।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল্ জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি

বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে: প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্ণমেণ্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল,- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন

বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না পত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে পারবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। জয় বাংলা।

প্রাসঙ্গিক ঘটনাক্রম

১ মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে লাখ-লাখ মানুষ রাজপথে বেরিয়ে আসে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে অব্যাহতভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে সামরিক জান্তার বুলেটের আঘাতে ঢাকাতে ২৬ জন আর চট্টগ্রামে ১২ জন নিহত হয়। খুলনায় মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় ২১ জনকে। এমনিভাবে যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, দিনাজপুরসহ নানা স্থানে অনেকে নিহত হয়। কিন্তু বিপ্লবী জনতা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ মানুষের বিশাল জনসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। এই ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ঘোষণা হিসেবে পরিগণিত হয়। ৭ই মার্চ ছিল বাঙালির জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন।

৭ই মার্চ বেলা ৩:২০ মিনিটে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রের জবাবদানে জনতার সামনে উপস্থিত হন বঙ্গবন্ধু। ওই দিন বঙ্গবন্ধু ছিলেন একমাত্র বক্তা। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণ আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণ বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছে স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ঘোষণা সম্পর্কে আপনার অনুভূতি ব্যক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হিসেবে কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হবার মুহূর্ত পর্যন্ত বীর বাঙালি এই ভাষণের নির্দেশনাকে মান্য করে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ৭ই মার্চের ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধু কখন সভা মঞ্চে উপস্থিত হন ?

(ক) ৩:২০ মিনিটে (খ) ৩:২৫ মিনিটে

(গ) ৩:৩০ মিনিটে (ঘ) ৩:১৫ মিনিটে

২। ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

(গ) তাজউদ্দিন আহমেদ (ঘ) আতাউল গণি ওসমানী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

হাবিব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দশম শ্রেণীতে পড়তো। প্রথমে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। কিন্তু একজন মহান রাজনীতিকের জাদুকারি ভাষণে সে রোমাঞ্চিত হয় এবং নির্ভয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৩। হাবিব কার ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়-

(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) তাজউদ্দীন আহমেদ (ঘ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান

৪। উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উক্ত ভাষণের উদ্দেশ্য হিসাবে সমর্থনযোগ্য হল-

i) জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে

ii) জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা

iii) পশ্চিম পাকিস্তানীদের মুখোশ উন্মোচন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) iও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.১৩ মুজিবনগর সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট ও আনুষ্ঠানিক সরকার গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অস্থায়ী সরকারের গঠন ও সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আন্তজার্তিক, সার্বভৌম, সাংগঠনিক, প্রতিরোধ, অস্থায়ী সরকার, বৈদ্যনাথ তলা, স্বীকৃতি, শপথ গ্রহণ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় এই সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রবল রূপ নেয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট সংঘটিত হবার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী বাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হবার পূর্বমুহূর্তে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চের ভয়াবহ গণহত্যার সময় আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ বাসভবন ছেড়ে যান। তিনি বাংলাদেশ সরকার গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেন। প্রথমে আত্মরক্ষা, তারপর প্রস্তুতি এবং সর্বশেষে পাল্টা আক্রমণ এই নীতিকে কার্যকর করার জন্য তিনি এই চিন্তা করতে থাকেন। ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন ফরিদপুর-কুষ্টিয়া পথে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে পৌঁছান। ৩১ মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপকালে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপন করেন। বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দীন জানান যে, পাকিস্তানী আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ২৬ মার্চেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে সরকার গঠন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীই মন্ত্রী সভার সদস্য। দলীয় প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে দিল্লির উক্ত সভায় তাজউদ্দীন নিজেকে প্রধানমন্ত্রীরূপে তুলে ধরেন। বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, উপযুক্ত সময়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হবে। এভাবেই অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ধারণার সূচনা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন

তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের একটি অধিবেশন আহ্বান করেন। উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১১ এপ্রিল এম.এ.জি. ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ১১ এপ্রিল বাংলাদেশ বেতারে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণা দিয়ে ভাষণ প্রদান করেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার এক আম বাগানে মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সকাল ৯ টা থেকেই সেখানে নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিদের আগমন শুরু হয়। দেশি-বিদেশি প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১ টায় শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একে একে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর তিন সহকর্মীকে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় নামে সাতটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এরপর নতুন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে কর্নেল ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে কর্নেল আবদুর রবের নাম ঘোষণা করেন। এরপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঐ দিন থেকে শপথ অনুষ্ঠানের স্থানটির নাম দেয়া হয় মুজিবনগর। অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। ভাষণের শেষাংশে তিনি বলেন, 'বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেন না, আর কোন জাতি আমাদের চাইতে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি। অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয় বাংলা।' এই ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানালেন। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সূচনা হল।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই যুদ্ধকে সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্য তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর তারই ফলশ্রুতিতে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুর জেলার (তৎকালীন মহকুমা) বৈদ্যনাথ তলায় মুজিবনগর সরকারের জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোথায় মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?

(ক) কলকাতায় পার্ক সার্কাস এভিনিউ (খ) আগরতলা

(গ) শিলিগুড়ি (ঘ) বৈদ্যনাথ তলা

২। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখ?

(ক) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল (খ) ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল

(গ) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল

নিচের ছকটি লক্ষ করুন ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সরকার

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমেদ

অর্থমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এএইচএম কামরুজ্জামান

৩। উপরের ছকে বর্ণিত সরকার কোন নামে দেশে-বিদেশে পরিচিত অর্জন করে ?

(ক) পূর্ব পাকিস্তান সরকার (খ) পূর্ব বাংলা সরকার

(গ) মুজিবনগর সরকার (ঘ) কলকাতা প্রবাসী সরকার

৪। উপরের ছকে বর্ণিত সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করে?

(ক) কলিকাতার পার্ক সার্কাস এভিনিউয়ে

(খ) আগরতলায়

(গ) শিলিগুড়িতে

(ঘ) মেহেরপুরের ভবের পাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননে

পাঠ-২.১৪ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অপারেশন সার্চ লাইট, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী শিবির, সেক্টর কমান্ডার

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাঙালিদের উপর অপারেশন চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়। অপারেশন সার্চলাইট নামক ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে প্রথম সদর দপ্তরটি গঠিত হয়। এখানে ৫৭ তম বিগ্রেডের বিগ্রেডিয়ার আরবাবকে ঢাকা নগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং মেজর জেনারেল খাদিম রাজাকে প্রদেশের অবশিষ্টাংশে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। অপারেশনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। পরিকল্পনা মোতাবেক ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ওয়ারলেস বসানো জিপ ও ট্রাকে করে ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের প্রথম সাঁজোয়া বহরটি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এক কিলোমিটারের মধ্যে ফার্মগেট এলাকায় ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। কয়েকশ লোক প্রায় ১৫ মিনিট ধরে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেয়। সেনাবহর শহরময় ছড়িয়ে গণহত্যা শুরু করে । নিরস্ত্র জনগণের উপর এই হামলা ও নির্বিচার গণহত্যা অভিযান বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সকল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তৎপর হয়ে উঠে। শত্রু সেনারা সংখ্যায় অনেক ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, তাই এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৭ মার্চ বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর সরকারের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বাঙালিদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ভারত তার সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত বরাবর শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে মুক্তিবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সদর দপ্তরে একত্রিত হন। এ সভায় চারজন সিনিয়র কমান্ডারকে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। মেজর সফিউল্লাকে সিলেট-ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অঞ্চলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হয়। কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের অধিনায়কের দায়িত্ব পান মেজর খালেদ মোশাররফ। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মেজর জিয়াউর রহমান এবং কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের অধিনায়ক হন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বময় নেতৃত্ব দেয়া হয়।

১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার তথা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। পরদিন তাজউদ্দীন আহমদ আরও তিনজন আঞ্চলিক অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেন। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ রংপুর অঞ্চলের, মেজর নাজমুল হক

দিনাজপুর-রাজশাহী-পাবনা অঞ্চলের এবং মেজর এম. এ. জলিল বরিশাল-পটুয়াখালি অঞ্চলের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। প্রতিটি অঞ্চলকে একেকটি সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১০ থেকে ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের এক সম্মেলনে অপারেশন চালানোর সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টর ও বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১ নং সেক্টর: চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হরিনাতে। সেক্টর প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জিয়াউর রহমানকে। পরে মেজর রফিকুল ইসলাম সে দায়িত্ব পান।

২ নং সেক্টর: ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয় ২ নং সেক্টর। আগরতলার ২০ মাইল দক্ষিণে মেলাঘরে ছিল এ সেক্টরের সদর দপ্তর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। মেজর খালেদ মোশাররফ পরবর্তীতে মেজর এ.টি.এম হায়দার দায়িত্ব পান।

৩ নং সেক্টর: উত্তরে চূড়ামনকাঠি (শ্রীমঙ্গলের নিকট) থেকে সিলেট এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত হয় ৩ নং সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে.এম শফিউল্লাহ। পরে দায়িত্ব পান মেজর এ.এন.এম নূরুজ্জামান।

৪ নং সেক্টর: উত্তরে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট থানা পর্যন্ত ১০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে ৪নং সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। পরে দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন এ রব। এর হেডকোয়ার্টার ছিল প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে আসামের মাসিমপুরে।

৫ নং সেক্টর: সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকি (তামাবিল) এবং জেলার পূর্বসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। হেড কোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে।

৬ নং সেক্টর: সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে গঠিত। প্রধানত রংপুর ও দিনাজপুরের ইপিআর বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার। সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকটবর্তী বুড়িমারিতে।

৭ নং সেক্টর: রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত হয়। ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক এবং পরে সুবেদার মেজর এ. রব ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল বালুরঘাটের নিকটবর্তী তরঙ্গপুরে।

৮ নং সেক্টর: এপ্রিল মাসে এই সেক্টরের অপারেশনাল এলাকা ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা। মে মাসের শেষে অপারেশন এলাকা সঙ্কুচিত করে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ নিয়ে এই সেক্টর পুনর্গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম.এ মঞ্জুর। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পশ্চিমবঙ্গের বেনাপোলে।

৯ নং সেক্টর: বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটের নিকটবর্তী টাকিতে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ জলিল এবং পরে মেজর এম.এ মঞ্জুর ও মেজর জয়নাল আবেদিন।

১০ নং সেক্টর: নৌ-কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়।

১১ নং সেক্টর: টাঙ্গাইল জেলা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের। মেজর তাহের যুদ্ধে গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহকে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।
১২ এপ্রিল থেকে এই সদর দপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. এ. রব এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে যথাক্রমে চিফ অব স্টাফ এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। নাগাল্যান্ডের দিমাপুরে ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। অনুরূপভাবে, পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা নৌসেনাদের নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর প্রথম নৌবহর বঙ্গবন্ধু নৌবহর উদ্বোধন করা হয়।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন।

আত্মসমর্পণ
এগারো নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সৈন্যরা ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার টঙ্গীর কাছে পৌঁছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে তারা সাভারে অবস্থান নেয়। সকাল দশটায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকায় প্রবেশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খসড়া দলিল নিয়ে অপরাহ্ণ এক ঘটিকায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বিকাল চারটায় ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছেন। মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে সাক্ষর করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমপর্ণের বর্ণনা দিন।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবকসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসের সর্বাত্মক যুদ্ধ আর ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয়ী হয় বীর বাঙালি। আমরা পেলাম একটা নতুন দেশ। অভ্যুদয় হল স্বাধীন বাংলাদেশের ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

(ক) ১০ (খ) ১১
(গ) ১৩ (ঘ) ১৫

২। প্রবাসী সরকার বা মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) তাজউদ্দীন আহমেদ

(গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই শোষক গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেলে কাটিয়েছেন। তাঁর এই প্রতিবাদের সফল পরিণতি দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতার পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান।

৩। নেলশন ম্যান্ডেলা কে কোন বাঙালি নেতার সাথে তুলনা করা যায়?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

৪। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় কোনটি?

ক) শেখ সাহেব খ) বঙ্গবন্ধু গ) জাতির পিতা ঘ) সবটি

পাঠ-২.১৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা পারবেন।
- জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাতিসংঘ, আন্তজার্তিক, সম্প্রদায়, ভেটো, একাত্মতা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে এক অসামান্য ঘটনা। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার এ লড়াই বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে, পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন, অন্যদিকে বাংলাদেশের পক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি অবস্থান গ্রহণ। বস্তুত, তৎকালীন দুই পরাশক্তির মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রতিফলিত হয়।

ভারতের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চূড়ান্ত বিজয় আসার আগেই ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শেষ দিক পর্যন্ত সময়কালে ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আশ্রয়দান করে। কলকাতায় অবস্থিত প্রবাসী সরকারের কার্যক্রমে সহায়তা দেয় ভারত। এছাড়াও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সামরিক সহায়তা প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য কূটনৈতিক প্রচারণা অব্যাহত রাখে ভারত। মে মাসের প্রথম দিক থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধানের জন্য কূটনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা জোরদার করে ভারত। এ সময় ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সমর্থনদানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে কার্যকর সমর্থন পায়। ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সনের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার। নিক্সন-কিসিঞ্জার নিয়ন্ত্রিত মার্কিন নীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পরিচালিত হয়। যুদ্ধচলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও বস্তুগত উভয়ভাবেই সহায়তা করে। নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের কিছুই করার নেই বলে জানান। উল্লেখ্য, মধ্য-পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সিয়াটো ও সেন্টো নামে দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তি তথা মৈত্রী জোট গঠন করে। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বস্ত মিত্রকে রক্ষা করতেই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন দেয়। ২৫ মার্চ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে না জড়িয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে। জুলাই মাসে কিসিঞ্জার গোপনে পাকিস্তানের সহায়তায় চীন সফর করেন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো হয়। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানায়।

পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সংলাপ আয়োজনের চেষ্টা করে। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তেমন ফল লাভ হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন দেখল যে, জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করা যাচ্ছে না তখন তাঁরা সামরিক হুমকির আশ্রয় নেয়। দেশটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে যুদ্ধবিরতি মানতে বাধ্য করা, পাকিস্তানকে রক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করা। ৯ ডিসেম্বর নিক্সন ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরে মোতায়ন করেন, যাকে ভারত সরকার পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করার হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই হুমকির জবাবে সোভিয়েত নৌ বাহিনী নিউক্লিয়ার মিসাইলবাহী দুটি ডুবোজাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিহার করার জন্য তার নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থনদানের নীতির অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমর্থন দেয়। এছাড়াও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও চীনকে হীনবল করার বিষয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবনায় থাকতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ২ এপ্রিল, ১৯৭১ সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোনি পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে একটি পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা জরুরিভিত্তিতে বন্ধ করার এবং বিদ্যমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান চীনের সহযোগিতা পায়। ১৯৬৭-১৯৬৮ সালে পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষ শক্তিতে পরিণত হয়। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রকে সমর্থন দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণত তার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে সমর্থন দিত। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে চীনের ভূমিকা কী হবে তা সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। জুলাই পর্যন্ত দেশটি নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। জুলাই মাসে কিসিঞ্জারের চীন সফরের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবস্থান পরিবর্তন করে। আগস্ট মাসে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১-১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তিনবার ভেটো দেয়। উল্লেখ্য, পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

চীনের ভূমিকা

চীনের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। এশিয়া মহাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র ছিল ভারত । ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রশ্নে মত পার্থক্য শুরু হয়। তখন থেকেই দুটি রাষ্ট্র ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই সীমান্ত যুদ্ধে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সমর্থন না করে ভারতকে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে, ১৯৫২ সাল থেকেই পাকিস্তান ছিল চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার ওপরে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিছুটা হলেও নির্ভর করত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়।

জাতিসংঘের ভূমিকা

১৯৭১ সালে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম। বাংলাদেশের গণহত্যা ও নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থানট ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট পত্র লেখেন। তিনি বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ প্রেরণের প্রস্তাব দেন । ১৯৭১ সালের ১৯ মে মহাসচিব পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আগত এক কোটি শরণার্থীর জরুরি সাহায্যের জন্য সকল রাষ্ট্র ও সংগঠনের প্রতি আহবান জানান। তাদের আশ্রয় ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করে। এর উল্টোদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মত পরাশক্তির চাপে জাতিসংঘকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির বাঁচা-মরার লড়াই। এ যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিসমূহ নিজ-নিজ মতাদর্শিক অবস্থান ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে ভূমিকা গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত বাংলাদেশকে অনবদ্য সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ?

(ক) ৫ ডিসেম্বর (খ) ৬ ডিসেম্বর

(গ) ৭ ডিসেম্বর (ঘ) ৮ ডিসেম্বর

২। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী দেশ কোনটি?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন

(গ) ভারত (ঘ) কোনটি নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মলি তার নানার কাছে গল্প শুনেছে যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অনেক দেশই আমাদের রাষ্ট্র পূণর্গঠনে সাহায্য করেছে।

৩। বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে কোন দেশ?

(ক) ভারত (খ) যুক্তরাজ্য

(গ) ইরাক (ঘ) ইরান

৪। বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করায় স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছে-

i. সামরিক সহায়তা

ii. কূটনৈতিক তৎপরতা

iii. বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রচারনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল:-

১। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর মধ্যে একটি রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে বাস করতো মোট জন সংখ্যার প্রায় ৫৬ ভাগ জনগণ। রাষ্ট্রটির রাজধানী, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় পশ্চিম অংশে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পদে ছিলেন সব পশ্চিমারা। তারা পূর্ব অংশের অধিবাসীদের উপর সব সময় বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। পূর্ব অংশের ছাত্র সমাজ ষড়যন্ত্র রুখতে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য দেশটির সরকার নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য লোকের প্রাণ হানি ঘটায়।

(ক) উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি উথাপন করেন কোন গণপরিষদ সদস্য?

(খ) ১৯৫৪ সালে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের পটভূমি উল্লেখ করুন।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে কি কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পান ? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ছাত্র সমাজের আন্দোলটির অবদান মূল্যায়ন করুন।

২। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে 'ছয়দফা' কর্মসূচি একটি অনন্য দলিল। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ছয় দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে গণরায় আসে। যা জন্ম দেয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। তাই ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বা বাঙ্গালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

(ক) কখন কোথায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় ?

(খ) কখন কোথায় এবং কীভাবে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) "ছয়দফা বাঙালির মুক্তি সনদ বা বাঙালীর ম্যাগনাকার্টা" উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।

৩। নিচের ছকটি লক্ষ করুন ও প্রশ্নের উত্তর দিন।

সরকার

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপরাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এএইচএম কামরুজ্জামান

(ক) কত মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়?

(খ) বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেন ?

(গ) উল্লিখিত ছকটি বাংলাদেশের কোন সরকারকে নির্দেশ করে ?

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে উক্ত সরকার গঠনের তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

৪। রহিম সাহেব তার নাতনীকে একটি গণঅভ্যুত্থানের গল্প শুনাচ্ছিলেন । তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে এ আন্দোলন সারা দেশজুড়ে প্রবল হয়ে উঠলে শাসক গোষ্ঠী মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামীকে মুক্তিদান করে।

(ক) কে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন ?

(খ) ছাত্রদের ১১ দফার গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি উল্লেখ করুন।

(গ) উদ্দীপকে যে মামলার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১	ঃ	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২	ঃ	১। গ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩	ঃ	১। ঘ	২।গ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪	ঃ	১। খ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫	ঃ	১। খ	২। খ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭	ঃ	১। ক	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। ঘ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯	ঃ	১। খ	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১১	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১২	ঃ	১। ক	২। ক	৩। খ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৩	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। গ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৪	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৫	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ